ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

শুকুর মাহ্‌মুদের গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস: একটি পর্যালোচনা

*আহম্মদ শরীফ

সারসংক্ষেপ: মধ্যযুগে নাথধর্মকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য ধারার বিকাশ ঘটে তাই নাথসাহিত্য নামে পরিচিত। নাথধর্মের সাধন-ভজনের নানা প্রণালিই এ শ্রেণির সাহিত্যগুলোর মূল উপজীব্য। ধ্যান ও যোগের দ্বারা অমরত্ব লাভ করা নাথধর্মাবলম্বীগণের অন্যতম উদ্দেশ্য। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে গুরুভজনা এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের বন্ধন ও ষড়রিপুর মায়া ত্যাগ করে গুরু নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে হবে এটাই নাথপন্থীদের বিশ্বাস। নাথসাহিত্যগুলো নাথধর্মগুরুদের গুণকীর্তনে মুখরিত। নাথগুরুগণ অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা নানা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। হিন্দু দেব-দেবীদের তুলনায় নাথগুরুদের মহিমা অনেক উচ্চে এমন ধরণাও নাথপন্থীগণ পোষণ করেন। নাথসাহিত্য ধারার অন্যতম কবি শুকুর মাহ্‌মুদ। তিনি রাজশাহীর অদূরবর্তী সিন্দুর কুসুম্বী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যের নাম *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*। কাব্যটি কবির পরিণত বয়সে লেখা। রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, রানিদের মায়া, প্রজাদের ভালোবাসা ইত্যাদি ত্যাগ করে তরুণ গুপিচন্দ্র মাতৃ-আদেশে অমরত্ব লাভের জন্য গুরু হাড়িপার সঙ্গে সন্ন্যাসযাত্রা করলেন। এ করুণ কাহিনিই কাব্যের মূল বিষয়। *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্য রচনায় শুকুর মাহ্‌মুদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যটিতে গভীর তত্ত্বের পাশাপাশি কবি কাহিনি বর্ণন, সমাজচিত্র অঙ্কন, ছন্দ-অলঙ্কারের প্রয়োগ, ভাষার ব্যবহার, ঘটনার অনুক্রম তৈরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সফলতার দাবিদার। নাথসাহিত্য ধারার অন্যান্য কাব্যের চেয়ে *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব তাই সহজেই অনুমেয়। বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে নাথধর্মের স্বরূপ ও *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্যের নানা বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগের স্থিতি। এ সময়ে বিচিত্রমুখী সাহিত্যধারা বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ; দান করেছে গতিময়তা। মধ্যযুগের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গলকাব্য* পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে বাংলা সাহিত্যের উর্বর ভূমিতে ফলেছে শতশত সাহিত্যে। মধ্যযুগের এ সমস্ত সাহিত্যে জনমনে সাহিত্যরসের পিপাসা নিবৃত্ত করেছে। মধ্যযুগে সাহিত্যধারার এ ব্যাপকতায় সংযোজিত হয়েছে নাথসাহিত্য। মূলত নাথধর্ম বা নাথসম্প্রদায়ের কাহিনিকে কেন্দ্র করে এ শ্রেণির সাহিত্যের সৃষ্টি। নাথসম্প্রদায় ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সাধন পদ্ধতি হলো যোগাভ্যাস। নাথপন্থিগণ বিশ্বাস করেন তাঁদের আচরিত সিদ্ধমত বা সিদ্ধমার্গের সাহায্যে সাধনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে তথা সিদ্ধি লাভে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। ভোগে নয়, ত্যাগের মধ্যদিয়ে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ তথা মহাজ্ঞান লাভে জীবনের যথার্থ অর্থ নিহিত এটাই তাঁদের ধারণা। নাথ উপাধিধারী যোগী বা যুগী সম্প্রদায়ের গুরুদের জীবনালেখ্য এ শ্রেণির কাব্যগুলোর মূল উপজীব্য। সংসারধর্মের চেয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান এবং হিন্দু দেব-দেবীর তুলনায় নাথগুরুদের মহিমা অনেক উজ্জ্বল, নাথধর্মী কাব্যের কবিরা তা প্রমাণে ছিলেন সচেষ্ট। নাথসম্প্রদায় এক সময় ভারতে গুরু সম্প্রদায় হিসেবে খ্যাতি অর্জন

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নজিপুর সরকারি কলেজ, পত্নীতলা, নওগাঁ

করেছিল এবং অনেক প্রভাবশালী রাজাও নাথগুরুদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। অনেকে মনে করে নাথধর্মের সৃষ্টি বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম থেকে। বৌদ্ধ ও শৈবধর্মের সমন্বয়ে নাথপন্থার সৃষ্টি সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য:

> এ সম্প্রদায়ের পরিচয় সূত্রে সিদ্ধমত, সিদ্ধমার্গ, যোগমার্গ, যোগসম্প্রদায়, অবধূত মত, অবধূত সম্প্রদায় ইত্যাদি পদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু এ সম্প্রদায়ের মুখ্য ধর্মীয় সাধন-পদ্ধতি যোগাভ্যাস, সুতরাং শুধুমাত্র যোগ সম্প্রদায় বলে এঁদের উল্লেখ করলেও অন্যায় হয় না। এঁরা এঁদের ধর্মীয় মার্গকে সিদ্ধমত বা সিদ্ধ-মার্গ এ কারণে বলেন যে, এ পথেই আকাঙ্ক্ষিত সাধনার সিদ্ধি অনিবার্য।[১]

আবার অন্যমতে নাথপদবিধারী যোগী বা যুগী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ বা গোরক্ষনাথ-এঁদের বংশে। এ সম্পর্কিত কল্যাণী মল্লিক-এর মতামত তুলে ধরছি:

> আগমসংহিতা মতে ঈশ্বর হইতে যোগী একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি, এই একাদশ রুদ্রের মধ্যে মহাযোগীই প্রধান। মহাযোগীর পুত্র বিন্দুনাথ, বিন্দুনাথের পুত্র আদিনাথ (আইনাথ), এই আদিনাথই রুদ্রকুলের প্রকাশক। বিন্দুনাথের বংশে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।[২]

বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার শূন্যবাদ, হিন্দুতন্ত্রের জ্ঞানমার্গীয় যোগবাদ এবং গুরুবাদের সংমিশ্রণে নাথধর্ম গড়ে ওঠে। নাথধর্মের সঙ্গে যোগসাধনার সম্পর্ক রয়েছে। যোগ ও সাংখ্য আসলে অভিন্ন। যোগ হচ্ছে সাধন পদ্ধতি আর সাংখ্য হচ্ছে সাধন মত বা দর্শন। এটি এ দেশের আদিম ধর্মশাস্ত্র ও অধ্যাত্মদর্শন। এ সাধনা দেহতত্ত্বকে গুরুত্ব দেয়। যে দেহাধারে চৈতন্যের স্থিতি, তাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই যোগের মাধ্যমে দেহকে আয়ত্ত করে সাধনা চলে। প্রাগার্য যুগে যে যোগসাধনার উদ্ভব হয়েছিল তা বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রচার লাভ করে কালক্রমে একটি বিশিষ্টরূপ লাভ করে। অবশ্য এই মৌলিক যোগসাধনার সঙ্গে নানা স্থানীয় উপকরণ যুক্ত হয়ে একটি মিশ্ররূপে নাথধর্মের সৃষ্টি হয়। যোগসাধনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় এ সম্প্রদায়ের লোকজন যোগী বা যুগী নামেও পরিচিত। বাংলা যোগসাধন থেকে নাথধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত:

> যোগসাধনা আত্মিক শক্তি দ্বারা শারীর শক্তি নিয়ন্ত্রণের সাধনা; ইহার মধ্যে ঈশ্বর কিংবা অলৌকিক অন্যান্য কোন বহিঃশক্তির উপর একান্ত নির্ভরশীলতার কথা নাই, ইহা ক্রিয়া মাত্র-দেহ ইহার ভিত্তি, মন ইহার নিয়ামক। ইহার সাধনায় পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত দেহ ও মন ব্যতীত আর কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন কাল হইতেই ইহার সাধনায় দুইটি ধারা অনুসরণ করা হইয়া আসিতেছে, একটি পাতঞ্জল নির্দিষ্টপথে অভিজাত ধারা, আর একটি লৌকিক ধারা। লৌকিক ধারাটিই উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কালক্রমে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে-বাংলার নাথধর্ম ইহাদেরই অন্যতম রূপমাত্র।[৩]

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-এর মতে 'নাথপন্থ খ্রিস্টীয় নবম শতকের শেষে প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে, তারপরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করে।'[৪] এই যোগী সম্প্রদায় মূলত শিবোপাসক। নাথসম্প্রদায়ের মতে শিব হতে যোগসাধনার উৎপত্তি: শিবের নিকট থেকে যোগাভ্যাস শিক্ষা করে মৎস্যেন্দ্রনাথ তা মানবকল্যাণের জন্যে জীবজগতে প্রচার করেন। নাথসাহিত্যে শিবের চেয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর শিষ্যগণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

বাংলা নাথধর্মের জনপ্রিয়তার কারণে এ ধারাকে কেন্দ্র করে অনেক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। শুধু বাংলা ভাষাতেই নয় সংস্কৃত, হিন্দি ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় নাথসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। নাথদর্শন পুরনো আমলে সৃষ্টি হলেও এর সম্প্রসারণকালে পুরনো আমলে সৃষ্ট নাথসাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। বরং মুখে মুখে গীত হয়ে তা চলে এসেছে আধুনিক কাল পর্যন্ত। 'নাথ আখ্যানগুলো দশ-এগারো শতকেই বৌদ্ধ বজ্র-সহজযানীদের প্রাবল্যের যুগেই রচিত তথা মুখে মুখে চালু হয় বলে স্বীকার করতে হয়।'[৫] নাথসাহিত্যের 'মৌখিক ধারার রচনা রংপুর থেকে সংগৃহীত। লিখিত পুঁথির অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, দিনাজপুর থেকে এবং দু-একখানি পুঁথি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত। ভণিতায় কবিদের নাম ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় জানা যায় না। সুতরাং কে কোন অঞ্চলের কবি, তা স্থির করে বলা দুঃসাধ্য।'[৬]

নাথসাহিত্যের পরিচয় সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন, 'নাথসাহিত্য বলতে আমরা নিম্নলিখিত রচনাগুলোকেই জানি: ১. গোরক্ষবিজয় ২. মানিকচন্দ্র রাজার গান ৩. ময়নামতীর গান ৪. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ৫. যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত ৬. চোরঙ্গীনাথ ৭. সাধন মাহাত্ম্য ৮. যোগীর গান ৯. যোগী কাচ ১০. যোগচিন্তামণি।'[৭] বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গুপিচন্দ্রের কাহিনি সম্পর্কিত গান ছাপার আকারে প্রকাশ করেন স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন। '১৮৭৩-১৮৭৭ পর্যন্ত রংপুরের জেলা প্রশাসক থাকাকালে তিনি বিখ্যাত 'মানিক চন্দ্রের গান'- 'The Song of Manik Chandra' একজন সাধারণ কৃষকের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন এবং মোট ৭৩৩১ লাইনের গীতিকাটি দেবনাগরী অক্ষরে মূল বাংলা পাঠের সঙ্গে সহজ ও প্রাঞ্জল ইংরেজি অনুবাদসহ ১৮৭৮-এর 'জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' পত্রিকায় [JASB, XLVII (1878), pp.135-238] প্রকাশ করেন।'[৮] এই গীতিকাটি মূলত সুরে গাওয়া হতো। গীতিকাটি কীভাবে গাওয়া হতো সে সম্পর্কে তিনি বলেন:

> The song is usually sung by four men, and in parts, not in union. This is sung chant-like, so as to go once to each line but leaving the three last notes without words "He Raja'', "He Raja'', "He Mayana'', or "He Jame'' or some such apostrophe which depends on the person whose adventure are being immediately narrated are sung as a short burden [ibid, p147.[৯]

স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন *A song of Gorakhnath* নামের আরো একটি গীতিকা ১৮৭৭ সালে আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে ময়নামতী ও গুপিচন্দ্র সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি দুর্লভ মল্লিক রচিত ও শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত *গোবিন্দ্রচন্দ্রের গীত (রাজা গোবিন্দ্রচন্দ্রের গান)*। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (১৯০১) প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে মুন্সী গোলাম রসুল খন্দকারের সম্পাদনায় *শুকুর মামুদের পাঁচালী* নামের কাব্যটি কলকাতা থেকে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২) প্রকাশিত হয়। কবি ভবানীদাস বিরচিত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত *ময়নামতীর গান* কাব্যটি ঢাকা থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪) প্রকাশিত হয়। সবশেষে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার সম্পাদনায় *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্যটি বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় *গোপীচন্দ্রের গান* গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে *গোপীচন্দ্রের গান* (রংপুরের

মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত), শুকুর মাহ্মুদের *গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস* এবং ভবানী দাসের *গোপীচন্দ্রের পাঁচালী* নামের তিনটি কাব্য স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন নামের প্রাপ্ত কাব্যগুলোর মূল কাহিনি ও বিষয় একই। রাজা মানিকচন্দ্র ও ময়নামতীর পুত্র গুপিচন্দ্রের রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনিই সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

শুকুর মাহ্মুদ ছিলেন নাথসাহিত্যের অন্যতম কবি। তাঁর *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্যটি *যোগীর পুঁথি* বা *ময়নামতীর পুঁথি* নামেও প্রচলিত। 'রামচন্দ্রের বনবাস যেমন ভারতের এক জাতীয় মহাকাব্যের প্রেরণা দিয়াছিল, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসও তেমনই বাঙ্গালী জাতির এক সার্থক মৌখিক কাব্য রচনার প্রেরণা দিয়াছে।'[১০] এ গাথাগুলোর জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ হলো এর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। আর তাই মুসলমান কবিগণও এ ধারার কাব্য রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। এ গানগুলো হিন্দু-মুসলমানসহ সব ধর্মের লোকের কাছে সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শুকুর মাহ্মুদ স্থানীয়দের কাছে 'শুকুর ফকির' নামে পরিচিত ছিলেন। এখনো শুকুর মাহ্মুদের জন্মস্থান রাজশাহীর নওহাটার নিকটস্থ সিন্দুর কুসুম্বী গ্রামে কবির নিজ বসতভিটা 'শুকুর ফকিরের ভিটা' নামে পরিচিত। কবির উক্তি:

ভাবিয়া [আপন] মনে শুকুর মামুদে ভণে
কুসুম্ব সিন্দুরে বাস।[১১]

কবির পিতা শেখ আনার (আনোয়ার) ছিলেন ফকির বা সাধক। কবি নিজেও সাধক ছিলেন। 'শুকুর মামুদের আসল নাম ছিল আব্দুশ শুকুর, গ্রামবাসীদের কল্যাণে শুকুর মামুদে রূপান্তরিত হ'য়েছে। কবির ভাষায়:

আব্দুশ শুকুর নাম পিতায় রাখিল।
শুকুর মামুদ নাম কুলেতে ঘুষিল॥[১২]

কবির জন্মসাল সম্পর্কিত কোনো তথ্য কাব্যে নেই। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য:

> কাব্যটিতে যে পরিমাণ কবির গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং ভোগের পরিবর্তে ত্যাগের মহিমাকে যেভাবে উঁচুতে স্থান দেয়া হয়েছে তাতে রচনাটি যে কবির পরিণত বয়সের তা' মীমাংসা হয়ে যায়। এদিক থেকে বিচার করলে কবির জন্মকাল হবে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকের কোন এক সময়। কাব্যের মধ্যে কবির আবাসস্থল, পিতার নাম প্রভৃতি বিষয়েরও কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৩]

নানা যুক্তি বিচারে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কবির জন্ম ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ[১৪] বলে মনে করেন। মুহম্মদ আবূ তালিব শুকুর মাহ্মুদকে ১৮ শতকের[১৫] প্রথম ভাগের কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাব্যটি ১১১২ বঙ্গাব্দ বা ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ তারিখে (মতান্তরে আশ্বিন মাসের ৭ তারিখে) সমাপ্ত হয়। এ সম্পর্কে কবির ভাষ্য:

১১ সও ১২ সালে দিন সাত ষষ্ঠী।
তখনি যোগান্ত পুস্তক ভূমে হইল সৃষ্টি॥[১৬]

কবি শুকুর মাহ্মুদের প্রাপ্ত একমাত্র কাব্য *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*। যুবা বয়সে রাজা গুপিচন্দ্রের অনিচ্ছাকৃত সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ এবং পরিশেষে মহাজ্ঞান লাভ করে অনিবার্য সত্য মৃত্যুকে এড়ানো এ কাব্যের মূল বিষয়। রাজ্য, রাজমহল, রানিদের সংশ্রব, প্রজাদের

ভালোবাসা, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ত্যাগ করে রাজা গুপিচন্দ্র সন্ন্যাসব্রত পালনে বেরিয়ে পড়লেন গুরু হাড়িপার হাত ধরে। রানিদের অনুরোধ-উপরোধ, প্রজাদের কান্না, পাত্রমিত্রদের বিধি-নিষেধ ইত্যাদি সত্ত্বেও মাতৃ-আদেশ শিরোধার্য করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন অনিশ্চিত জীবনের টানে। পথপ্রদর্শক হলেন গুরু হাড়িপা। এই করুণ বিরহগাথা নিয়েই *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্যের কাহিনি নির্মিত। কাহিনি পরিক্রমায় জানা যায় মৃকুল শহরের রাজা মানিকচন্দ্রের একমাত্র রানি ময়নামতী স্বামীসঙ্গ ছাড়াই গুরু গোরক্ষনাথের বরে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। মহাধূমধাম করে পুত্রের নামকরণসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান পালিত হলো। নবজাতকের নাম রাখা হলো গুপিচন্দ্র। সন্তান জন্মদানের পরে ময়নামতী গুণবতী দাই-এর হাতে সন্তানের ভার অর্পণ করে ধ্যানস্থ হলেন। পিতা মানিকচন্দ্র ১২ বছর বয়সে গুপিচন্দ্রকে বিয়ে করিয়ে সিংহাসনে বসালেন। রাজ্য, রাজরানি, প্রজা ইত্যাদি নিয়ে গুপিচন্দ্র সুখেই ছিলেন। ইতোমধ্যে মানিকচন্দ্রের মৃত্যু হলে ময়নামতী প্রাসাদে ফিরে এসে পুত্রের অকাল মৃত্যুর শঙ্কায় ভীত হলেন। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী '১৮ বছর অন্তর ১৯শে মরিবে'[১৭] স্মরণ হলো। ময়নামতী তাই পুত্রকে আসন্ন মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে গুরু হাড়িপার সঙ্গে সন্ন্যাসযাত্রার আহ্বান জানালেন। কারণ হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণে গুপিচন্দ্র অমরত্ব লাভ করবেন। কিন্তু গুপিচন্দ্র হাড়িপাকে গুরু মানতে অস্বীকৃতি জানালেন। ময়নামতী পুত্রকে নানাভাবে বোঝালেন; হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ না করলে তাঁর মৃত্যু অবধারিত। অবশেষে গুপিচন্দ্র সবকিছু ত্যাগ করে গুরু হাড়িপার সঙ্গে সন্ন্যাসযাত্রা করলেন। দীর্ঘ এক বছর বারাঙ্গনা সুলোচনীর গৃহে কষ্ট ভোগের পরে গুরুর দয়ায় গুপিচন্দ্র মুক্তি পেলেন। হাড়িপা তাঁকে 'অগম সাগর'-এর কূলে 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা দিলেন:

অগম সাগরের জলে করাইল স্নান।
অন্ধ ছিল রাজা চক্ষু পাইল দান॥[১৮]

'মহাজ্ঞান' শিক্ষা করে গুপিচন্দ্র অমরত্ব লাভ করলেন। গুপিচন্দ্র রাজ্যে ফিরে এলে মা ময়নামতী ছেলেকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। নাথধর্মের গূঢ়তত্ত্ববিষয়ক নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে পুত্রের জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করা হলো। মা ও পুত্র উভয়েই নিজ নিজ গুরুর ধ্যানে ধ্যানস্থ হলেন। কাহিনির এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কবি শুকুর মাহ্‌মুদ কাহিনি বর্ণনা ও ঘটনার অনুক্রম তৈরিতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনিটি দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কবি অনেক ক্ষেত্রে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। সাবলীল কাহিনিটি পড়তে গেলে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। কাব্যে একটিমাত্র উপকাহিনি সংযোজনেও কবি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। কাহিনির সুদৃঢ় গাঁথুনি লক্ষণীয়। সমালোচকের ভাষায়- 'গীতিকা সম্পর্কে প্রথম কথাই হইতেছে যে, একটি বিশিষ্ট কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইবে-এই কাহিনী শিথিলবদ্ধ হইলে চলিবে না বরং দৃঢ়বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।'[১৯] *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্য কাহিনি প্রধান রচনা। এর কাহিনিটি শিথিল নয়, বরং দৃঢ়বদ্ধ। কবি শুকুর মাহ্‌মুদ কাহিনি বর্ণনা ও ঘটনার অনুক্রম তৈরিতে বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনিটি দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কবি অনেক ক্ষেত্রে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে শুকুর মাহ্মুদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নামতী, হাড়িপা, গুপিচন্দ্র. খেতুয়া, সুলোচনী ইত্যাদি চরিত্র জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। চরিত্রগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটা বাস্তবতার আলোকে চিত্রিত। ময়নামতী মাতৃত্বের প্রতীক। পুত্রের আসন্ন মৃত্যু চিন্তা তাঁকে বারবার ক্ষত-বিক্ষত করেছে। পুত্র গুপিচন্দ্র হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসযাত্রা না করলে মৃত্যু ঘটবে এ চিন্তা তাঁকে সর্বদা বিচলিত করেছে। তাই তিনি পুত্রকে বারবার যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে গুপিচন্দ্র হাড়িপাকে পৈঘরে পুতে রাখলে তিনি পুত্রের বিপদ বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হয়েছেন। পুত্রকে অনেক বোঝানোর পরে গুপিচন্দ্র সন্ন্যাসযাত্রায় রাজি হলে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। গুরু হাড়িপার সঙ্গে যোগী সেজে সন্ন্যাসযাত্রায় বেরিয়ে গুপিচন্দ্র অমরত্ব লাভ করলে ময়নামতী নিশ্চিন্ত মনে ধ্যানস্থ হয়েছেন। হাড়িপা যোগীপুরুষ হলেও সাধারণ মানুষের মতোই প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসায় স্নাত। তিনি সিদ্ধি লাভ করেও ক্রোধ মুক্ত নন। তাই গুপিচন্দ্রের অবিকল স্বর্ণপ্রতিমা ভস্ম বা শিষ্য কানুপাকে অভিশাপ দিতে দ্বিধান্বিত নন। আবার সন্ন্যাসযাত্রাকালে পথশ্রান্ত গুপিচন্দ্রের প্রতিও তিনি মায়ামমতা বর্জিত নন। সুলোচনীর বাড়িতে অসহ্য কষ্ট ভোগ করে গুপিচন্দ্র গুরুকে স্মরণ করলে হাড়িপা এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। স্নেহ, মায়া, মমতায় হাড়িপা চরিত্রটি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছে। রাজা গুপিচন্দ্র এ কাব্যের চৌম্বক চরিত্র। রাজৈশ্বর্য ও হেরেমের নারীদের ভালোবাসা, ভোগবিলাস ইত্যাদি ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনের দুঃখকষ্ট ও কঠিনব্রত পালন করা যে কারো জন্যই কঠিন। ভোগবাদী জীবন বারবার গুপিচন্দ্রকে হাতছানি দিয়েছে, কিন্তু মাতৃ-আদেশে অমরত্ব লাভের উদ্দেশ্যে জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দিয়ে ত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে গুপিচন্দ্র সংসার ছেড়েছেন। তাঁর সন্ন্যাসযাত্রা কাঁদিয়েছে রানিদের, পাত্রমিত্রদের, প্রজাদের। প্রথম দিকে গুপিচন্দ্র দ্বিধান্বিত ছিলেন। একদিকে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় জ্ঞান লাভ অন্যদিকে ভোগবিলাসী জীবন এ দুয়ের মধ্যে তিনি বারবার ঘুরপাক খেয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেছেন। হাড়িপার সঙ্গে যাত্রাপথে কাঁটায় শরীর রক্তাক্ত হয়েছে, নগ্নপদ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, সুলোচনীর গৃহে অভুক্ত থেকে কঠোর শাস্তি ভোগ করেছেন- তবুও তিনি কঠিনব্রত ত্যাগ করেননি। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন।

খেতুয়া ও সুলোচনী অনেকটা বাস্তবতার আলোকে চিত্রিত। নফর খেতুয়ার ভূমিকা সমস্ত কাব্যে না থাকলেও সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিতে চরিত্রটি উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। রানিদের চক্রান্তের দোসর হিসেবে হাড়িপাকে হত্যায় সহযোগী হওয়া, হাড়িপা কর্তৃক বরপ্রাপ্ত কিংবা ময়নামতীর স্নেহভাজন হওয়া -এ সবই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সম্ভব হয়েছে। একান্ত নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে রাজকর্ম পরিচালনায় সে গুপিচন্দ্রকে সহায়তা করেছে। সুলোচনী চরিত্র অনেকটা উজ্জ্বল। সমাজ নিষিদ্ধ হয়েও সমাজের একজন হিসেবে এ কাব্যে তার সরব উপস্থিতি। কাহিনির বাঁক পরিবর্তনে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে প্রয়োজনে কঠোর হতে পারে। গুপিচন্দ্র তার পাপ প্রস্তাবে সম্মত না হলে তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছে। গুরু হাড়িপার কাছে সুদসহ বন্ধকের টাকা আদায় করে সে চাতুর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস কাব্যে প্রতিফলিত সমাজ ও সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় হলেও আজো তা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহক। এ কাব্যে মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের এক বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কবি শুকুর মাহ্মুদ ছিলেন মরমি ভাবধারার কবি। তাঁর কাব্যে মূলত তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্বের আড়ালে তৎকালীন সমাজের নানা খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। কবি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু অবলোকন করেছেন। তিনি কোনো সভাকবি বা রাজকবি ছিলেন না। কোন রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি কাব্যটি রচনা করেননি। কাজেই তাঁর কাব্যে সামন্তপ্রভুদের দরবারের জৌলুস, শানশওকত, ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। এমনকি তাঁর চিত্রিত মৃকুলের রাজা মানিকচন্দ্র কিংবা রাজা গুপিচন্দ্রও সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছেন। গুরু গোরক্ষনাথ, কানুপা, হাড়িপা (হাড়িফা), রানি ময়নামতী প্রমুখ ব্যক্তি যোগী হলেও সাধারণ মানুষের মতোই তাঁদের আচার-আচরণ। তাই তাঁর কাব্যে আমরা যে মানুষের দেখা পাই তারা সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, আমোদে-প্রমোদে, আহারে-বিহারে আমাদের মতোই রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষ। তাদের আনন্দ-অনুভূতি, আবেগ-আহ্লাদ আমাদের হৃদয়ে দোলা দেয়, দ্যোতনার সৃষ্টি করে:

> গোপীচন্দ্রের গানগুলি ততটা মার্জিত ও সুন্দর না হইলেও তাহা বঙ্গীয় কুটীরগুলির নিখুঁত ছবি আঁকিয়া দেখাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই– অন্ততঃ এই সকল গানের কথা মাঝে মাঝে এত স্পষ্ট, এত অন্তর–ছোঁয়া যে, আধুনিক কবিরা এত সংক্ষেপেও এত জোর দিয়া একটা কথা বুঝাইতে পারেন কি না সন্দেহ।[২০]

কবি শুকুর মাহ্মুদ সাধারণ কবি। বাস করেছেন বর্তমান রাজশাহী শহরের (রামপুর-বোয়ালিয়া) উত্তর-পূর্বে ছয় মাইল দূরবর্তী সিন্দুর-কুসুম্বী গ্রামে (বর্তমান নাম সিন্দুর-কুসুম্বী নামোপাড়া, প্রকৃত অর্থে সিন্দুর-কুসুম্বী একটি মৌজার নাম)। বর্তমান সময়েও উক্ত গ্রাম একটি সাধারণ গ্রাম। কবি গ্রামে বসবাস করে সাধারণ মানুষের নানা চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন- বাস্তববাদী কবির দৃষ্টি দিয়ে। সেই বাস্তবতার আলোকে তিনি কাব্যের চরিত্রগুলো চিত্রিত করেছেন। তাই রাজদরবারের রাজা মানিকচন্দ্র, রাজা নিহালচন্দ্র, রাজা মহিচন্দ্র কিংবা রাজা গুপিচন্দ্র আমাদের মতোই রক্তমাংসের, আবেগ-অনুভূতি দিয়ে তৈরি সাধারণ মানুষ। কাজেই তাঁর কাব্যের যে সমাজ তা সাধারণ মানুষের সমাজ। যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দিয়ে তিনি সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করেছেন- তা আমাদের এক জন লোককবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তৎকালীন সমাজে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের নানা জাতির মানুষ বসবাস করত। 'ব্রাহ্মণ শ্রীজন' থেকে শুরু করে বেদে, নটিনী, রাখাল, ভিক্ষুক, বোষ্টম, বৈরাগী, তাঁতি, ধোপা, মালি, তেলি, কায়স্থ, বৈদ্য, গোওয়াল, নাপিত, কামার, কোতোয়াল, বেলদার, সোনার, চোর-ডাকাতসহ নানা পেশার ও শ্রমজীবী মানুষের বসবাস লক্ষ করা যায়। সমাজে বিশেষ করে কারও পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পরিবারের সবাই আনন্দিত হতো। সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে নানা সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হতো। সমাজে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনযাপন প্রণালির পার্থক্য ছিল চোখে পড়ার মতো। তখনকার সময়ে শিক্ষা পদ্ধতি ছিল গুরুকেন্দ্রিক বা টোলকেন্দ্রিক। গুপিচন্দ্রকে 'জ্ঞান' শিক্ষার জন্য গুরু হাড়িপার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে। ময়নামতীকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে পাঠশালায়

পাঠানো হয়েছে। শিশু বয়সে ময়নামতীর বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়েছে। হাতে খড়ি নিয়ে প্রতিদিন সকালে ময়নামতী গুরুর বাড়িতে জ্ঞানার্জনের জন্য যেতেন। ময়নামতীর উক্তি:

বালক অবধি আমার নাহি কোন কাম।/ সর্বক্ষণ শুনি আমি ভাগবত পুরাণ॥
পিতা বলে জন্মিল কন্যা বড় ভাগ্যমান।/ সর্বক্ষণে শাস্ত্র শুনে অতি ধর্মজ্ঞান॥
এতেক ভাবিয়া পিতা আপনার মনে।/ পড়িবার দিল আমারে দ্বিজ গুরু স্থানে॥
প্রাত:কালে [প্রাতঃকালে] প্রতিদিন হস্তে করি খড়ি।/ পড়িবার কারণে আমি যাই গুরুর বাড়ি॥
এহি রূপে শাস্ত্র পড়ি গুরুর পাঠশালে।/ উদএ হইল গুরু আমার কপালে॥[২১]

মৃত স্বামীর সাথে জীবিত স্ত্রীকে একই চিতায় শবদাহকে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা বলা হয়। মধ্যযুগে হিন্দুসমাজে এ প্রথার ব্যাপক প্রচলন লক্ষণীয়। 'বহু স্মৃতিকার-ই সহমরণ-ব্যবস্থার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সহমরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর সতীদাহ প্রথা নিষেধ করে ব্যর্থ হন। ধর্মান্তরিত নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা কোথাও কোথাও অজ্ঞতাবশত অনুসৃত হতো।'[২২] এ কাব্যে সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা মানিকচন্দ্র 'তিন দিনের জ্বরেতে' মারা গেলে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে তাঁকে গঙ্গার কূলে নিয়ে গিয়ে চারদিকে কাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হলো। চিতায় শবকে 'উত্তর শিওরে' শোয়ানো হলো। রানি ময়নামতী স্বেচ্ছায় চিতায় উঠে রাজার বামপাশে আসন গ্রহণ করলেন। চারিদিকে কাঠ সাজানোর পরে ময়নামতীর আদেশে চিতায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো:

উত্তর শিওরে রাজাক চুলিত শোওয়াইল।/ রাজার বাম পাশে মুনি আসন করিল॥
চতুর দিকে কাষ্ঠ তাহার দিল সাজাইয়া।/ মুনির আজ্ঞাএ অগ্নি দিলেন জ্বালাইয়া॥[২৩]

এ চিত্র আমাদের *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)-এর মেঘনাদ-প্রমীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তৎকালীন সমাজে বিয়ে উপলক্ষে জামাইকে যৌতুক দেওয়া হতো। ধনসম্পদ থেকে শুরু করে নানা ধরনের জীবজন্তু ঘোড়া, হাতি এমনকি স্ত্রীর ছোট বোনকেও যৌতুক দেওয়ার রীতি প্রচলন ছিল। বহুবিবাহ ছিল তৎকালীন সমাজের আর একটি দিক। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ঘেসেড়ানী এগারোটি বিয়ে করেছে। 'বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।/ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥' *পদ্মাবতী* কাব্যে রত্নসেনের দুই স্ত্রী নাগমতী এবং পদ্মাবতী। আলোচ্য কাব্যে গুপিচন্দ্র চন্দনা, ফন্দনা, অদুনা ও পদুনাকে বিয়ে করেছেন:

তিন বিভা করিল রাজা পাইল চারি নারী।/ বিভা করিয়া রাজা অইল নিজ পুরী॥
বিভাহ হইল রাজার মধুর বাজনে।/ ধ্যানেতে আছিল মুনি কিছুই নাহি জানে॥[২৪]

'নানা শুভ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ছাড়াও গৃহ-নির্মাণে ও গৃহ-প্রবেশে, স্নানে, বিশেষ করে পার্বণিক স্নানে, নববস্ত্র পরিধানে কিংবা পরিহার কালে মাস-দিন-ক্ষণ-গ্রহ-নক্ষত্র-রাশি নির্ভর শুভাশুভ জানতে ও মানতে হতো, এখনো হয়।'[২৫] তখনকার সমাজে দিনক্ষণ, তিথি, পঞ্জিকা ইত্যাদি দেখে শুভকর্মাদি সম্পন্ন হতো। গুপিচন্দ্রের তিন বিয়ের সময়ে শুভ লগ্ন দেখে বিয়ের দিন তারিখ ও লগ্ন ধার্য করা হয়েছিল। বর্তমান সময়েও বাঙালিদের মধ্যে কোথাও যাত্রাকালে বা বিয়ে-শাদিতে এরূপ রীতির প্রচলন দেখা যায়। পূজা-পার্বণ, বিয়ে বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা করা হতো। গুপিচন্দ্রের বিয়ে উপলক্ষে নৃত্যগীতাদি ও গানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাতিল ডুবানোর রীতিও সে সমাজে প্রচলিত

ছিল। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এ রীতির প্রচলন ছিল বেশি। বিয়ের সম্বন্ধ উপলক্ষে পাত্রপক্ষের ঘটক পাত্রী দেখতে গিয়ে পাত্রী পছন্দ হলে পাতিল ডুবিয়ে পছন্দের বিষয়টি জানাত।

তখনকার সমাজে জাতপাত ভেদাভেদ ছিল চোখে পড়ার মতো। গুণ থাকলে নিম্ন শ্রেণির লোকের পক্ষেও গুরুর পদ অধিকার করা অসম্ভব ছিল না। হাড়িপা তাঁর যোগবলে জ্ঞানলাভ বা সিদ্ধিলাভ করে গুরুর আসনে সমাসীন হয়েছেন। সমাজে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ অর্থাৎ সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল- তারা ছিল ঘৃণিত। সর্বকালে সব সমাজেই জাতপাতের ভেদাভেদ লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদেও এমন চিত্র দুর্লভ নয়। সে সমাজে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি দলিত সম্প্রদায়ের লোক সমাজের বাইরে বসবাস করত। তারা ছিল সমাজে অধিকার বঞ্চিত অস্পৃশ্য। কৃষ্ণপাদের ১০ সংখ্যক চর্যায় রয়েছে, 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।' কবি শুকুর মাহ্‌মুদের সময়ে এসেও সমাজের এই চিত্রের খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যাবে না। কারণ তখনো সমাজে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ লক্ষণীয় ছিল। রাজা গুপিচন্দ্র মা ময়নামতীর নির্দেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জ্ঞান শিক্ষা করতে রাজি হলেন। কাকে গুরু ধরে তিনি জ্ঞান শিক্ষা করবেন এমন প্রশ্নের উত্তরে ময়নামতী গুরু হাড়িপার নামোচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাম রাম বলে গুপিচন্দ্র মুখের পান মাটিতে ফেলে দিলেন। কারণ তিনি রাজা হয়ে একজন হাড়ির কাছে কীভাবে জ্ঞান শিক্ষা করবেন? হাড়ি তো নীচু জাত! আর তাই:

যেই মাত্র শুনিল গুপি হাড়িফার নাম। / কর্ণে হাত দিয়া রাজা বলে রাম রাম॥
হাড়িফার কথা শুনি কান্দিতে লাগিল।/ মুখের তাম্বুল রাজা তখনে ফেলিল॥
গুফিচন্দ্র বলে মাও গেল জাতিকুল।/ হাড়ির সেবক হব আর নাহি মূল॥[২৬]

সে যুগে যেমন দাস প্রথার প্রচলন ছিল তেমনি দাসদের ওপর নানা অমানুষিক অত্যাচারও করা হতো। সুলোচনী যে মনস্কামনায় গুপিচন্দ্রকে ক্রয় করেছিলেন তা সিদ্ধ না হওয়ায় তাঁর প্রতি অত্যাচার শুরু করে। তখনকার সমাজে চোর-ডাকাতের উপদ্রব যেমন ছিল, সেই চোর-ডাকাতকে ধরার জন্যে বা তাদের শাস্তি বিধানের জন্যে থানা-পুলিশ বা কোতোয়ালও ছিল। পণ্ডিতব্যক্তি বা গুরুকে সমীহ করা ছিল সাধারণ রীতি। সেকালে সাধু-যোগী-দরবেশদের প্রভাব সমাজে বেশি ছিল। যোগী বা যুগীরা সমাজের বাইরে গুহা বা নির্জন বনে জ্ঞানসাধনা করতেন। নারীদের জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ময়নামতী গুপিচন্দ্রকে জ্ঞান দানের জন্য হাড়িপার কাছে অনুরোধ করলে তিনি গুপিচন্দ্রের সংসার জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ থেকে তৎকালীন সমাজে বামাবর্জিত যৌগিক সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়:

স্ত্রী লইয়া [যেবা] করে সংসারে বসিত।/ অমর হইতে পারে কি তার শকতি॥
রাজ্য করে গুপিচন্দ্র লইয়া চারি নারী।/ কিমত প্রকারে তাহাক জ্ঞান দিতে পারি॥
নারী পুরী ছাড়ি যদি হএ দেশান্তর। / সেবক করিয়া তখন করিব অমর॥[২৭]

গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস কাব্যে গুপিচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধীয় বর্ণনায় বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির এক অকৃত্রিম ছবি ফুটে উঠেছে। বিবাহ উপলক্ষে সাজসজ্জা, বাদ্য-বাজনা, নৃত্য-গীত, বর যাত্রীদের গমন, বরকে বরণ, বিবাহ বাড়িতে অনুষ্ঠান ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও- সেখানে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দুর্লভ নয়। গুপিচন্দ্রের বিয়েতে শুভ

দিনক্ষণ দেখে বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হলো। বিয়ের দিনে চারি দিকে কলার গাছ স্থাপিত হলো। বাড়িকে আলপনার রঙে রাঙিয়ে তোলা হলো। গুপিচন্দ্রকে চন্দন দিয়ে স্নান করানোর পরে উত্তম পোশাক ও অলঙ্কার পরানো হলো। সুবর্ণ দোলায় করে রথ-রথীসহযোগে 'বৈরাতি' নিয়ে যাওয়া হলো।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিজীবী সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষকরা লাঙ্গল-গরুর ওপরই নির্ভর করেছে চিরকাল। তারা লাঙল-গরু দিয়ে জমি চাষ করে। লাঙল তৈরি করা হতো লোহা দ্বারা। মাটিতে 'বিছন' (বীজ) বপন করা হতো। অনেক সময়ে সেই বীজ অঙ্কুরিত হতো না। কোনো কোনো কৃষক নিজের জমি না থাকায় অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করত। এ সমস্ত চিত্র আজো কৃষিভিত্তিক সমাজে দেখা যায়। তবে কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপকরণ এ কাব্যে প্রতীকী আকারে এসেছে:

আপনার হাল গরু বেগেনার জমি চাষ।/ আব্বলের ক্ষয় আর বিছনের বিনাশ॥
লোহা দিয়া বান্ধে লাঙ্গল মাটিতে জাএ ক্ষএ। /থোড় কলা বাঁদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ॥[২৮]

সমাজে নানা চালচিত্র খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে কবি অবলোকন করেছেন। কিছু কিছু বিষয় হয়তো কবির অভিজ্ঞতালব্ধ। পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে নারী সাজার বিষয়টি যাত্রাগানসহ নানা গানে প্রচলিত ছিল। খাওয়ার পরে ঘরের চালা থেকে 'খড়িকা' সংগ্রহ করে মুখে জমে থাকা খাবার বের করার প্রক্রিয়াও কবির অগোচরে থাকেনি। এভাবে কবি বাস্তব জীবন ও জগৎ থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করে লেখনীর জাদুকরী স্পর্শে তিলোত্তমা সৃষ্টি করেছেন। আর এ তিলোত্তমার প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে দেশ-কাল-সমাজের নানান বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র।

শুকুর মাহ্মুদের অন্যতম উদ্দেশ ছিল নাথধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা। শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে কাব্যে উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক মিল রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ তত্ত্বের নানা বিষয় এ কাব্যে পাওয়া যায়। চর্যাপদে যেমন প্রহেলিকা সৃষ্টি করে রূপকের মাধ্যমে সাধনপদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এ কাব্যেও তেমনটা দেখা যায়। যেমন ঢেণ্ঢণপাদের ৩৩ সংখ্যক চর্যায় রয়েছে:

বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পীঢ়া দুহিঅই এ তীনি সাঝে॥[২৯]

এ কাব্যে রয়েছে:

বলদ প্রসব হইল গাই হইল বাঞ্জা।/ বাছুরেক দোহাএ তাহার দিন তিন সাঞ্জা॥
ছঞ্চার পানি ফুটি টুঞি করিয়া ধাএ।/ শুয়া পক্ষি বসিয়া বিড়াল ধরিয়া খাএ॥[৩০]

এখানে বলদ অর্থে সক্রিয় মনকে বোঝানো হয়েছে। সক্রিয় মন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের সৃষ্টি করে বলে তাকে 'প্রসব হইল' বলা হয়েছে। এবং নৈরাত্মা বা দেবীরূপী শূন্যতাকে গাই রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বোধিচিত্ত যখন জাগতিক মোহকে অতিক্রম করে নৈরাত্মারূপিণী শূন্যতাকে লাভ করে তখন সে হয় বন্ধ্যা। এখানে 'বাছুর' মহাসুখ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হলে যে মহাসুখের (বাছুর) বা আনন্দধারার সৃষ্টি হয় তা প্রতিনিয়ত (দিন তিন সাঞ্জা) প্রবাহিত হচ্ছে।

নাথধর্মে নারীকে সাধন পথের অন্তরায় হিসেবে মনে করা হয়। এ সাধনা তাই নারীবর্জিত সাধনা। নাথগণ বিশ্বাস করেন শরীরের সমস্ত শক্তি থাকে লিঙ্গমূলে। তাঁদের বিশ্বাস দেহ থেকে নিম্নগামী রসধারা সুষুম্নার মধ্যে দিয়ে মস্তকে অবস্থিত সহস্রার সঙ্গে মিলিত করাতে পারলেই মহাসুখের অনুভূতি লাভ করা যায় এবং এভাবে নির্বাণ লাভ সম্ভব। নারীবর্জিত সাধনার ইঙ্গিত দিয়ে গুপিচন্দ্রের প্রতি তাই ময়নামতীর উক্তি:

হাটের নারী ঘাটের নারী নারী প্রতিঘরে ।/ যত পুরুষ দেখ সবে নারীর বেরণ করে॥
সহস্র ফোঁটা রক্তে হএ রতি মহারস ।/ সে ধন ফুরাইলে পুরুষ হএ নারীর বশ॥
সিংহের আকার নারী ব্যাঘ্রের মত চাএ ।/ হাড় মাংস শরীরে থুইয়া মহারস টানি লএ॥
পুরুষের ধন লয়া নারী বেপার করে ।/ লোভেতে থাকি পুরুষ সব বেগার খাটি মরে॥
আপনার হাল গরু বেগেনার জমি চাষ ।/ আব্বলের ক্ষয় আর বিছনের বিনাশ॥
লোহা দিয়া বান্ধে লাঙ্গল মাটিতে জাএ ক্ষএ ।/ থোড় কলা বাঁদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ॥
কাঁচা বাঁশে ঘুণ লাগিলে কতই ভর সএ ।/ মূল থুনিতে ঘুণ লাগিলে ঘর পড়িবার চাএ॥
বন্ধন ছুটিলে ঘরের নাহিক উপাএ ।/ ছুটিলে কতক ধ্বজা ঘর পড়ে যাএ॥
আউট [হাত] বৃক্ষের বাছা জোড়া দুইটি ফল ।/ নযরে পাপের কারণ সংসার বিকল॥[৩১]

ময়নামতী ও গুপিচন্দ্রের মধ্যে যোগের সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দুতন্ত্রের নানা বিষয় এ আলোচনায় উঠে এসেছে। যোগপ্রণালি সম্পর্কে গুপিচন্দ্রকে ময়নামতী জানিয়েছেন:

শুন বাছা গুপিচন্দ্র যোগের কাহিনী ।/ বাইন শুদ্ধ হইলে নৌকা না লইবে পানি॥
খাকের খুটি নৌকার টাটী আবের গড়া ।/ পবনে গুণ টানে নৌকা আতসের মোড়া॥
অসারের সার করি কেন রহিলি ভুলি ।/ মরিলে খাইবে মাংস শকুন শৃগালি॥
কাক কাণ্ডারী নাএর শকুন ভাণ্ডারী ।/ শৃগালে বলেন আমি নাএর অধিকারী॥
দুইখানি চৌউর নাএর বৈঠা দুইখানি ।/ ভমরা গোফাতে বৈসে আছে নৌকার দেয়ানি॥
পাঁচ পণ্ডিত লয়া মনুরাই বৈসে হৃদয় ।/ জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবা পরিচয়॥
কাণ্ডারী থাকিতে কেন যাএ অন্যঘাটে ।/ বাছিয়া লাগাও নৌকা নিরাঞ্জনের ঘাটে॥[৩২]

দেহরূপ নৌকার 'বাইন' শুদ্ধ হলে প্রবৃত্তিরূপ 'পানি' তাকে ডুবিয়ে দিতে পারে না। এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা-বাসনাকে 'পানি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুফিমতে মানব দেহ চার চিজ দিয়ে তৈরি। এ চার চিজ হলো মাটি, আগুন, বায়ু এবং পানি। নাথপন্থে যা খাক, আতস, বাত ও আব। দেহরূপ নৌকা অগ্নি দ্বারা মোড়া অর্থাৎ আবৃত। এবং বাত বা বায়ু (মনপবন) তাকে চালিত করে। মানবচিত্ত নশ্বর দেহকে সার মনে করে সবকিছু ভুলে থাকে। মৃত্যুর পরে এ দেহ মাটি ও বাতাসে মিশে যায়। তাই এখানে দেহের নশ্বরতা বোঝাতে দেহকে শৃগাল ও শকুনে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাক, শৃগাল এবং শকুন যথাক্রমে দেহের কাণ্ডারি, ভাণ্ডারি (রসদ সরবরাহকারী) এবং অধিকারী। যোগের ভাষায় কাক, শকুন এবং শৃগাল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভক্ষিত অর্থাৎ বিনষ্ট হবে। দেহরূপ নৌকাকে ইড়া ও পিঙ্গলা (ললনা-রসনা) নাড়ি চালিত করে। একে 'চৌউর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানবদেহের দুই পা'কে নৌকার দুই চৌউরের সঙ্গে এবং দুই হাতকে বৈঠার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পরমাত্মা নৌকাস্বরূপ দেহের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার জন্য বসে রয়েছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত নিয়ে জীবাত্মা অর্থাৎ বোধিচিত্তরূপ

মনুরায় হৃদয়ে অবস্থান করে। নিরঞ্জনের ঘাট বলতে উষ্ণীষ কমলকে বোঝানো হয়েছে। এটাকে শিবের হাটও বলা যেতে পারে। সাধনার ফলে সিদ্ধি লাভ করে সাধক নিম্নগামী রসকে ঊর্ধ্বগামী করে সহস্রার শিবের সঙ্গে মিলন ঘটাতে পারলে মোক্ষ তথা নির্বাণ লাভ সম্ভব। সহজযানীদের মতে নির্বাণ আনন্দময় এবং সাধনার চরম লক্ষ্য। চর্যাপদের ১, ৮, ১৩, ১৮, ২৭, ২৮, ৪৯ এবং ৫০ সংখ্যক পদে এ নির্বাণের উল্লেখ রয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে যেমন মহানদী, উপনদী ইত্যাদি রয়েছে দেহের মধ্যেও তেমনি নাড়িরূপ মহানদী, উপনদী ইত্যাদি বিদ্যমান। দেহের মধ্যে নাড়ির সংখ্যা মোটামুটি হিসাবে ৩২টি। এদের মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ি ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না (গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী) মহানদী বাকিগুলো উপনদী। দেহের শুক্র অথবা শক্তি থাকে লিঙ্গে। সাধনার দ্বারা ইড়া এবং পিঙ্গলাকে সুষুম্নার সঙ্গে মিলিত করে মূলাধার চক্রে কুণ্ডলীর মধ্যে সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী রূপিণী শক্তিকে (শুক্র) জাগ্রত এবং ঊর্ধ্বগামী করে দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ষট্চক্রকে ভেদ করে 'সহস্রারে' অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত করতে পারলেই মোক্ষ লাভ সম্ভব। হিন্দুতন্ত্রের মতো বৌদ্ধতন্ত্রেও ৩২ নাড়ির কথা স্বীকৃত। হিন্দুতন্ত্রে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বৌদ্ধতন্ত্রে ললনা, রসনা ও অবধূতিকা। নির্বাণ অর্থ হলো বাসনার নিবৃত্তি। সুফি মতে নির্বাণকে 'ফানা' অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিশে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। নির্বাণ ও ফানা সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য:

> সুফিদের ''ফনা'' বা ''অহং লোপ'' মতবাদের গোড়ায়ও ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। পারস্যের অন্তর্গত বিস্তামের মর্ম্মবাদী সাধক বায়িযীদ্ (মৃঃ-৮৭৪ খ্রীঃ) এই মতের প্রতিষ্ঠা করেন। বায়িযীদ্ বিস্তামীর গুরু 'অবু' অলী সিন্ধুদেশবাসী ছিলেন। সুতরাং বায়িযীদ্ এই মতবাদের ধারণাটি (Conception) যে তাঁহার গুরুর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভারতীয় প্রভাব নিহিতো আছে বলিয়াই, সর্ব্ববিষয়ে না হইলেও ইহার সহিতো অনেক বিষয়ে ''নির্ব্বাণ'' মতবাদের মিল রহিয়াছে। জগৎ হইতে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া আল্লার সহিতো মিশিয়া যাওয়ার অবস্থার নামই ''ফনা''; আর জগতের পাপ হইতে, কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া, ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটিলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের ''নির্বাণ'' লাভ ঘটে।[৩৩]

জাগতিক বস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে অবিদ্যার মোহ ধ্বংস করে সকল তৃষ্ণার বিলোপ সাধনের অর্থই হচ্ছে নির্বাণ। কবির ভাষায়:

> নিরঞ্জনের ঘাট বাছা অমূল্য ভাণ্ডার।/ সেহি ঘাটে নাহি বাছা জমের অধিকার॥
> নিরঞ্জনের বদলে [বাছা] গুরু প্বশনি।/ গুরুকে চিনিলে বাছা নিরঞ্জনকে চিনি॥
> দেহ মধ্যে গয়া গঙ্গা ত্রিপিণীর ঘাট।/ তাতে স্নান করিয়া কর শ্রীকলার হাট॥
> শ্রীকলার হাটে বাছা কর বিকিকিনি।/ বাছিয়া করোহ খরিদ অজপা নামের ধ্বনি।॥[৩৪]

সাধারণ অর্থে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলনস্থলই হলো ত্রিবেণীর ঘাট। হিন্দুতন্ত্র মতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলন কেন্দ্র মূলাধার চক্রে ত্রিপিণীর ঘাট। সহজিয়া বৌদ্ধ এবং নাথসিদ্ধাদের মতে ললনা, রসনা ও অবধূতিকার মিলনস্থল নির্মাণচক্র অর্থাৎ প্রবৃত্তির রাজ্যে এর অবস্থান। সুফিদের মতে এর স্থান ললাট বা ঊর্ধ্বদেশে। সুফি মতে সাধনপদ্ধতির চারটি স্তর যথা: শরিয়ত, তরিকত, হকিকত এবং মারফত কাব্যে নাসুত, মলকুত, জবরুত ও

লাহুত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শরিয়তের স্তর পার হয়ে তরিকতে, তরিকতের স্তর পার হয়ে হকিকতে এবং হকিকতের স্তর পার হয়ে মারফতে পৌঁছতে হয়। কাজেই এখানে বেছে খরিদ করার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা বাসনাকে মধ্যনাড়ি সুষুম্নার সঙ্গে মূলাধার চক্রে মিলিত এবং ঊর্ধ্বগামী করা হচ্ছে যোগসাধনার প্রথম স্তর। সেইজন্য 'ত্রিপিণীর ঘাটে' স্নান করার অর্থাৎ কামনা-বাসনাকে ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। জীবাত্মা বা সংবৃত বোধিচিত্তকে পরিশুদ্ধ করার প্রথম স্তর পার হয়ে শ্রীকলার হাটে কেনাবেচা করে অজপা অর্থাৎ 'হংসঃ' গায়ত্রী মন্ত্রকে গ্রহণ করতে হয়। কামনা-বাসনার বিনিময়ে তাকে নিতে হয়।

নাথধর্মের গূঢ়তত্ত্ব কেবল গুরুর পক্ষেই জানা সম্ভব। তাই গুরু নির্দেশিত পথে সাধনা করলেই মোক্ষ লাভ সম্ভব। নিরঞ্জনের পরিবর্তে গুরুকে ভজনা করলেও চলবে। কারণ গুরুকে চিনতে পারলে নিরঞ্জনকে চেনা যাবে। লালনের গানেও এ দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। সহজিয়া বৌদ্ধ এবং নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুর মর্যাদা অনেক উঁচুতে। চর্যাগীতিকায় গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। গুপিচন্দ্র সংসারের মায়া ত্যাগ করে হাড়িপার সঙ্গে সন্ন্যাসযাত্রা করেছেন। জ্ঞানসাধনার পরে তিনি অমরত্ব অর্জন করেছেন। ধ্যান ও জ্ঞানসাধনা করলে দেবগণও সাধকের আদেশ মেনে চলে। গ্রন্থে দেবতাগণ হাড়িপার আদেশ মান্য করেছে। তাই ময়নামতী পুত্রকে গুরু ধরে জ্ঞানসাধনার কথা বলেছেন:

মুখে জপ নিজ নাম শুন দুই কানে।/ বিস্মরিলে নাম শুনাএ গুরুজনে।
কাঞ্চন মানিক বাছা আছে ভরপুর।/ গুরুকে ভজিলে পাইবে আছে যতদূর॥
সর্ব্ব দেব হইতে বাছা গুরুদেব বড়।/ গুরু ভজ ধ্যান কর মায়ার জাল ছাড়॥
মায়ার জাল বিষম জাল যমরাজের থানা।/ গৃহেতে থাকিলে বাছা যমে দিবে হানা॥
হাড়িফার চরণ বাছা সেব দিবারাতি।/ কি করিতে পারে তোমাক যমের শকতি॥
দুই লোচন [দেখ] জীবের কিবা পশুপক্ষী।/ জ্ঞানসাধ ধ্যান কর সর্ব্বলোমে চক্ষি॥
ধ্যান করিলে দেব[গণ] হএ আজ্ঞাকারী।[৩৫]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা-বাসনার মোহজালে আবদ্ধ হয়ে বোধিচিত্ত অপরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায় (পরমাত্মা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সাধনার ফলে মোহমুক্ত বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারলেই 'নৈরাত্মারূপী' শূন্যতায় পৌঁছানো সম্ভব অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করা যায়। তাই লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধকে 'পরম দুর্জন' অর্থাৎ সাধনার অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা-বাসনার দাস হলে মুক্তি লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই সুপথে পরিচালিত হয়ে মনকে দৃঢ় করে সাধনপথের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। গুরু নির্দেশিত পথে চলে ষড়রিপুকে 'ক্ষেমাই অঙ্কুশ' দিয়ে বাঁধতে হবে। দেহের মধ্যে যে চঞ্চল চিত্ত তাকে স্থির করে সাধনপ্রক্রিয়া চালাতে হবে:

লোভ মোহ কাম ক্রোধ পরম দুর্জন।/ ক্ষেমাই অঙ্কুশ দিয়া করিনু বন্ধন॥
চারি সৃষ্টি মধ্যে মাতা ক্ষেমাই মহন্ত।/ চারি দুষ্টক তবে বান্ধিনু একত্র॥
ঘট মধ্যে জানি মাতা মনাই বড় চোর।/ তাহার প্রমাণ মাতা জানিনু অন্তর॥
ঘরের মধ্যে থাকে মনাই ডেড়ি টান টানে।/ সুপথ থাকিতে লইয়া যায় গহীন বনে॥
মনাকে বান্ধিনু মুই প্রেমের দড়ি দিয়া।/ তবে সে পাইনু ভেদ গুরুকে ভাবিয়া॥[৩৬]

হিন্দুতন্ত্র শাস্ত্র মতে মানবদেহ হলো বিপুল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তিস্বরূপ। বিশ্বের সবকিছুই মানবদেহে বিদ্যমান। 'পুষ্প মধ্যে গন্ধ যেন দুগ্ধ মধ্যে ননী।/শরীর মধ্যে তেমতি আছে চূড়ামণি॥'[৩৭] ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব থেকে শুরু করে সমস্ত দেবদেবীর অধিষ্ঠান এ দেহেই বিরাজমান। পরমাত্মা থেকেই জীবাত্মার সৃষ্টি। তাই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশবিশেষ। ইন্দ্রিয়লব্ধ ইহজাগতিক কামনা-বাসনা রূপ অবিদ্যার মোহজালে আবদ্ধ হয়ে জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জাগতিক মোহের কারণ যে অবিদ্যা, তাকে ধ্বংস করতে হয়। তবেই জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। কবির ভাষায়:

দ্বারী প্রহরী সব জাগিয়া ফিরে দ্বারে।/ ঘরের সর্বস্ব চুরি যাবে কোন প্রকারে॥
ঘটের ভিতরে তবে চতুরদশ ভুবন।/ ঘট চিনিলে তার নাহিক মরণ॥[৩৮]

এ কাব্যে চর্যাপদের মতো নানা সাংকেতিক ভাষায় সাধনতত্ত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন:

পৈখরেতে পানি নাহি পাহাড় কেন চোবে।
অন্ধলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে॥[৩৯]

এখানে 'পৈখর' বলতে দেহ তথা কায়াকে বোঝানো হয়েছে। 'পানি' অর্থে কামনা-বাসনা। অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত (জীবাত্মা) সাধনার ফলে উষ্ণীষ কমলে ধর্মকায়ের (পরমাত্মার) সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-বাসনার বিলোপ সাধিত হয়। এর ফলে শূন্যতার সৃষ্টি। আর তাই পৈখররূপ (পুকুর) 'দেহে' বাসনারূপ 'পানি' নেই। শূন্যতারূপ মহাসুখের আনন্দ দেহের সর্বত্র বিরাজমান। সেই আনন্দের ধারা সর্বাঙ্গে বয়ে চলছে অর্থাৎ 'পাহাড়' ভিজে যাচ্ছে। এখানে পাহাড় দেহের উচ্চ অংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'অন্ধলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে' এখানে গুরু অন্ধ এবং শিষ্য কালা। মহাসুখের উপলব্ধি গুরু যখন শিষ্যের কাছে ব্যক্ত করতে ইচ্ছে পোষণ করেন তখন তা শিষ্যের কাছে বোধগম্য হয় না। তাই শিষ্য কালা। আর এ মহাসুখের অনুভূতি গুরু নিজেও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে অক্ষম বা অবলোকন করতে পারেন না তাই তিনি অন্ধ। চর্যাপদেও এরূপ দেখা যায়। চর্যাপদের ৪০ সংখ্যক পদে রয়েছে: 'গুরুবোবে সে সীসা কাল।' মহাসুখের আনন্দ এমন অনির্বচনীয় যে গুরু শিষ্যের কাছে তা ব্যক্ত করতে পারেন না তাই গুরু বোবা আর এ অব্যক্ত অনুভূতি শিষ্য অনুধাবন করতে অক্ষম বলে তাকে কালা বলা হয়েছে। তুলনীয়:

ক্ষীরোদ মকর মণি কাছে কাছে দোলে।/ এহি বড় অপূর্ব চন্দ্রেক রাহু গিলে॥
কি করিতে পারে শ্রীনগরের কোতয়ালে।/ মকসের পশর হইল শকুন রাখালে॥
ভরিল ইন্দুরে নাও বিড়াল কাণ্ডারী।/ শুতিয়া আছেন ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহরী॥[৪০]

প্রকৃত অর্থে 'ক্ষীরোদ মকর মণি' বলতে ক্ষীরোদ সাগরে মণিখচিত কর্ণভূষণকে বোঝানো হয়েছে। তবে এখানে কামনা-বাসনার প্রতীক স্বরূপ অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্তকে 'ক্ষীরোদ মকর মণি' বলা হয়েছে। চিত্ত অস্থির থাকলে কামনা-বাসনার প্রতীকস্বরূপ অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত অকেজো হয়ে পড়ে। 'চন্দ্র' অর্থ পরমাত্মা এবং 'রাহু' অর্থ সংবৃত বোধিচিত্ত বা জীবাত্মা। ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়বাসনা দ্বারা পরিবেষ্টিত বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে জীবাত্মাকে পরমাত্মা গ্রাস করে তার অস্তিত্বকেই বিলোপ করে ফেলে। 'শ্রীনগরের কোতয়াল' যম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভাবান্বিত সংবৃত বোধিচিত্ত 'শকুন' ধর্মকায়কে (মকস) ভক্ষণ করে। কিন্তু সে যখন পরিশুদ্ধ হয় তখন সে ধর্মকায়ের

রক্ষক (পশর) হয়। তখন সাধকচিত্তের আর কোনো ভয় থাকে না। যমরাজ এসে তার কিছুই করতে পারে না। সাধকচিত্তের চঞ্চল অবস্থা বোঝানোর জন্যে 'ইন্দুরে'র সাথে তুলনা করা হয়েছে। যোগের ভাষায় এ দেহই নৌকা বা নাও এর সমতুল্য। সাধারণভাবে বিড়াল ইঁদুর ধরে খায়। কিন্তু বিড়াল এখানে ইঁদুরের রক্ষক। অর্থাৎ সংবৃত বোধিচিত্তরূপ বিড়াল কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জীবাত্মারূপ বিড়াল পরিশুদ্ধ হয়েছে এবং এ অবস্থায় বিড়াল ধর্মকায় তথা পরমাত্মার কাণ্ডারি (ইঁদুরের নৌকা) হয়েছে।

যোগের ভাষায় অব্যক্ত হতে ব্যক্ত বাহ্য স্থূলরূপের অভিব্যক্তি পর্যন্ত যে যে স্তর বা ক্রম আবির্ভূত হয় তার প্রত্যেকটিকে পিণ্ড বলা হয়। এরূপ ষট্‌পিণ্ডের দ্বারা চরাচর সংসিদ্ধ হয়। পর, অনাদি ও আদ্যপিণ্ড হতে নিরাকার স্বরূপ। আদ্যপিণ্ডই সাকার সৃষ্টির বীজস্বরূপ। আদ্যপিণ্ড হতে প্রথমে মহাকাশ, মহাকাশ হতে মহাবায়ু, মহাবায়ু হতে মহাতেজ, মহাতেজ হতে মহাসলিল এবং মহাসলিল হতে পৃথিবীর সৃষ্টি। উপনিষদ অনুসারে পঞ্চভূতের পাঁচ পাঁচ গুণ করে পঞ্চবিংশতি গুণই সাকার বা মহাসাকার পিণ্ড। শিব হতে ভৈরব, ভৈরব হতে শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ হতে সদাশিব, সদাশিব হতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হতে রুদ্র, রুদ্র হতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হতে ব্রহ্মা এ পর্যায়ক্রমে মহাসাকার পিণ্ডের অষ্টমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে। মাতৃগর্ভে জীব যে দেহপ্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন তার নাম গর্ভপিণ্ড। গর্ভপিণ্ডের ভ্রূণরূপে জীবনের পৃথিবীতে আগমন ঘটে। ভ্রূণ পিতামাতা হতে জাত। পিতামাতা ও সন্তান সকলেই শরীর বিশিষ্ট। শরীরী জীবদেহ এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও চৈতন্য এই পঞ্চ অন্তঃকরণযুক্ত। এ দেহও পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, তেজ ও ব্যোম) সমন্বয়ে সৃষ্ট। মানুষের পঞ্চশক্তি রয়েছে-ইচ্ছা, ক্রিয়া, মায়া, প্রকৃতি ও বাক্ শক্তি হলো পঞ্চশক্তি। জীবের এ শক্তিগুলোই শিব পথের অন্তরায়। তাই যোগপ্রণালিতে পিণ্ডতত্ত্বও জানতে হয়। বিশেষ করে 'আখেরে' পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে পিণ্ডতত্ত্ব জানা প্রয়োজন:

উজানি বহিয়া বাছা নাহি দেহ ভঙ্গ।/ যুগে যুগে থাকিবে পিণ্ড না ছাড়িবে সঙ্গ॥
এহিতো সংসারের [মধ্যে] মনাই ডাঙ্গাইত বড়।/ বিপতি পাথারে মনাই দাগা দিবে দড়॥
মন রাজা মন প্রজা মন সংসারে ধন্দ।/ মন বান্ধতন চিত্ত শুন গুপিচন্দ॥
মন ভাব মন চিন্ত মন করিয়া ভার।/ মন তন দৃঢ় করো আখেরে তরিবার॥[৪১]

যোগের ভাষায় 'শৃগাল' অর্থ বোধিচিত্ত। এবং 'সিংহ' অর্থ সহজানন্দ। সংসারের মায়ার বন্ধনে শৃগালরূপী বোধিচিত্ত সর্বদাই মরণ ভয়ে ভীত থাকে। সেই বোধিচিত্ত যখন সমস্ত কামনা-বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সহজানন্দকে অনুভব করতে পারে তখন সিংহকে জয় করতে পারে। এ সমস্ত তত্ত্বকথা কোটি লোকের মধ্যে কিছু লোক বুঝে 'কুটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝো॥' কুক্কুরীপাদের ২সংখ্যক চর্যাপদেও এমন প্রসঙ্গ রয়েছে, 'অইসনী চর্য্যা কুক্কুরীপা এ গাইল।/ কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সামাইল॥'[৪২] অন্য অর্থে অতি সূক্ষ্ম রেশমের মধ্যে গুটিপোকা অবস্থান করে। সময় হলে গুটিপোকা 'গুটিকা' কেটে বের হয়ে আসে। তেমনি ইন্দ্রিয় বাসনা দ্বারা আবৃত বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারলেই নির্বাণ লাভের আনন্দ অনুভব করতে পারে। এখানে 'নৌকা' হলো শূন্যতায় পরিপূর্ণ দেহ। যে দেহ শূন্যতার পরিপূর্ণ আনন্দ লাভে সক্ষম তা বিষয় বাসনা রূপ পানিতে ভেসে যায়। কবি দেহতত্ত্বের গূঢ় রহস্যভেদ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে যুজে।/ কুটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে॥
তবুত কোন লোক না বুঝে সন্ধান।/ ডুবিল সোনার নৌকা ভাসিয়া গেল জান॥[৪৩]

কবি শুকুর মাহ্মুদের শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে আমাদের মনে হয় সংস্কৃতসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল। কাব্যের বিভিন্ন উপাদান বিশেষ করে শব্দ, অলংকার, ছন্দ, হেঁয়ালি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের পরিপূর্ণতার কারণেই তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। তিনি ছিলেন বাঙালি কবি। শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। ভাষার ওপর তাঁর দখল ছিল। তিনি মধ্যযুগের সংস্কৃত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেন নি। সংস্কৃত ভাষা ও পৌরাণিক বিষয়ে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ছিল তা কাব্য পাঠেই উপলব্ধি করা যায়। পুঁথিসাহিত্যে বা জঙ্গনামা জাতীয় ধারার কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরও অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কবি শুকুর মাহ্মুদও কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এমনকি কোনো কোনো লাইনে একাধিক আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারও তিনি করেছেন। তবে এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবির পরিমিতিবোধ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন:

খাকের খুঁটি নৌকার টাটী আবের গড়া।
পবনে গুণ টানে নৌকা আতসের মোড়া॥[৪৪]

সংস্কৃত, তদ্ভব এবং বিদেশি শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি কবি প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত অনেক শব্দও কাব্যে ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার মোটেও বেমানান মনে হয় না। কবি নিসর্গ আশ্রিত ও মাটিঘেঁষা বিভিন্ন ধরনের শব্দচিত্র, রূপক ও উপমাদি ব্যবহার করেছেন। নায়িকার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যে সমস্ত রূপক-উপমা ব্যবহার করেছেন তার অধিকাংশ প্রকৃতি থেকে নির্বাচিত। গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত নানা শব্দও কাব্যে দুর্লক্ষ্য নয়।

ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবি শুকুর মাহ্মুদ -এর পাণ্ডিত্য লক্ষণীয়। তিনি কাব্যে অন্ত্যমিল বজায় রেখে নানা প্রকার পয়ার ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। পর্বে মাত্রাবিন্যাসের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু অসংগতি ছাড়া মোটামুটিভাবে তিনি ছন্দের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যধারাকে অনুসরণ করে কবি পয়ার ছন্দের ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, নাচাড়ি বা লাচাড়ি (দীর্ঘ ত্রিপদী), লঘু ত্রিপদী বা মধ্যছন্দ, খর্বছন্দ ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। পয়ার ছন্দের ক্ষেত্রে কবি স্বরসংযোজনের স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। এর ফলে ৮ মাত্রার স্থলে কখনো মাত্রা সংখ্যা হয়েছে ৭ বা ৯ আবার শেষের ৬ মাত্রার স্থলে মাত্রা হয়েছে কখনো ৭ বা ৮। যেমন:

	মাত্রা
এথা হাড়িফা সিদ্ধা/ আপন গোফাতে।	=৭+৬
ধ্যানে বসিল হাড়ি /ভাবিয়া ভোলানাথে॥	=৭+৭
চক্ষু মুদি রহিলো নাথ/ আপনার ধ্যানে।	=৯+৬
ভালমন্দ দিবা রাত্রি/ কিছুই নাহি জানে॥	=৮+৬
এথা গুপিচন্দ্র রাজা /আপন মহলে।	=৮+৬
রাত্রি বঞ্চিল রাজা /কামিনীর কোলে॥	=৭+৬

একে একে তিন দিন/ ভুঞ্জিল শৃঙ্গার। =৮+৬
তিন দিন অন্তরে গেল/ জ্ঞান সাধিবার॥ =৯+৬
সরোবরের কুলে রাজা /করিয়া আসন। =৯+৬
চিত্ত স্থির নহে রাজা[র] /নাম জপে অকারণ॥ =৮+৮
আকার হিসিকার /আর হুসুকার। =৭+৬
এসব ভুলিয়া নাম/ লাগিল জপিবার॥ =৮+৭
এহিরূপে জপে নাম/ সরোবরের কূলে। =৮+৭
পুষ্কুর্ণি শুকান রইল /না ভরিল জলে॥[৪৫] =৮+৬

কবিতা ছন্দ প্রধান আর গান সুর প্রধান। বাংলা নাথগীতিকাগুলো সুর করে গাওয়া হতো। এখনো কোন কোন এলাকায় এগুলো যুগীর গান বা যোগীর গান নামে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আগুনের মশাল হাতে নিয়ে এ গান পরিবেশন করার নিয়ম রয়েছে বলে গায়েনরা সাধারণত রাতের বেলায় তা পরিবেশন করে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শীতের রাতে এ গান পরিবেশিত হয়। তবে বছরের যে কোনো সময় মানত, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা লৌকিক উৎসবে এ ধরনের নাট্যমূলক গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে *মীন-চেতন* গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালীর মত:

> এমন এক সময় ছিল যখন আধুনিক কবি বা যাত্রার পালার ন্যায় এগুলি গ্রামে গ্রামে গীত হইত এবং জনসাধারণ এই সকল কাব্য হইতে উপদেশাদি গ্রহণ করিয়া তদানুসারে জীবন পরিচালিত করিয়া ধন্য হইত। মীনচেতন এখনও কোথায়ও গীত হয় কিনা অবগত হইতে পারি নাই, কিন্তু ময়নামতীর গান রঙ্গপুর জেলায় পূজা, পার্ব্বণ, উৎসব, মেলা ইত্যাদি উপলক্ষে এখনও প্রত্যেক বৎসর গীত হইয়া থাকে। যুগী জাতীয় জনসমূহই সাধারণতঃ এই গাথার গায়ক বলিয়া সাধারণ্যে ইহা যুগীযাত্রা বলিয়া পরিচিত। গম্ভীরার উৎসবের ন্যায় যুগীযাত্রাও রঙ্গপুর জেলার এক প্রধান বিশেষত্ব।[৪৬]

'এই জাতীয় কবিতার ছন্দে, বিশেষ করে পয়ারে অক্ষর ধ্বনি ছাড়াও প্রাধান্য লাভ করে সুরের প্রবাহ বা একটা টান বা তান। সেইজন্য অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই ছন্দকে তানপ্রধান ছন্দ নামে অভিহিত করেছেন।'[৪৭]এ কাব্যে কবি ছন্দের চেয়ে সুরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এগুলো আবৃত্তি করার সময় আমাদের কানে যতটুকু অসংগতি ঠেকে গান আকারে গাওয়ার সময় তেমনটা মনে হয় না। পর্বের মাত্রা বিন্যাসের অসংগতিটুকু গায়েনের কণ্ঠে সুরের জাদুস্পর্শে দূরীভূত হয়। লোককবির ছন্দ প্রয়োগ বিষয়ে *বাংলা লোকগীতিকার শিল্পরীতি* গ্রন্থে মাসুমা খানম-এর মন্তব্য তুলে ধরছি:

> নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সাহিত্যে স্বাধীন চিত্তবৃত্তি যুক্ত থাকে। স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পচেতনা ও দক্ষতা অনুযায়ীই তাঁরা ছন্দ ব্যবহার করেছেন শ্রুতি ও উচ্চারণের উপর নির্ভর করে। তাঁদের কাছে শাস্ত্র বা নিয়মের জটা তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি। এগুলোর সচেতন ব্যবহারেও লোককবিদের আগ্রহ থাকে না। তাঁরা পারিপার্শ্বিক আবহ ও চিরচেনা পরিবেশ থেকে কাব্যপ্রসিদ্ধি গ্রহণ করে ছন্দকেও আটপৌরে জীবনের মতো করে গীতিকায় প্রয়োগ করেছেন।[৪৮]

ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহাকবি আলাওল, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কিংবা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মতো সফলতা দেখাতে না পারলেও কবি শুকুর মাহ্মুদ-এর কৃতিত্ব একেবারেই কম নয়।

লোককবি শুকুর মাহ্‌মুদ যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন তাকে তাই লোকচ্ছই বলা যেতে পারে। পর্ববিন্যাসের সামান্য কিছু অসংগতি ছাড়া তিনি ছন্দের ক্ষেত্রে অনেকটাই সফলতার দাবিদার।

কবি শুকুর মাহ্‌মুদ তাঁর কাব্যে অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছিলেন সচেতন। তিনি চেনা-জানা পরিবেশ থেকে উপাদান নিয়ে তাঁর কাব্যে অলংকারের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন:

> হারেমের সুন্দরীর সুবর্ণ খচিত বাহনের মতো ভাষাকে অধিকতর সুসজ্জিত করে ভাবকে তিনি আচ্ছন্ন করে রাখেননি। অথবা 'বিকিনির' স্বল্প পরিসর বস্ত্রখণ্ডে সুন্দরীর দেহকে আবরণমুক্তও করেননি। বরং এই দুই-এর মধ্যে একটি সুষম এবং মার্জিত সমন্বয়ের সফল প্রচেষ্টা গ্রন্থের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।[৪৯]

কবি শুকুর মাহ্‌মুদ তাঁর কাব্যে শব্দালংকার ও অর্থালংকার এ উভয় প্রকারের অলঙ্কারই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, ধ্বন্যুক্তি, বক্রোক্তি এবং অর্থালংকারের মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, নিদর্শন, ব্যতিরেক, বিরোধাভাস, সন্দেহ, অপহ্নুতি, ভ্রান্তিমান ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন সফলভাবে। 'কাব্যের অলঙ্কার এবং ভাষা বিশিষ্টতার দাবিদার। শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস ছাড়াও পাঠ্য এবং সুষমামণ্ডিত করেছে। অলঙ্কারের উৎস হিসেবে গ্রামীণ উপকরণই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।'[৫০] কাব্যে উপমা হিসেবে যে সমস্ত বস্তু, বিষয় বা প্রাণীর সঙ্গে পাত্রপাত্রী বা বিষয়ের তুলনা করা হয়েছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কবির পরিচিত জগৎ থেকে সংগৃহীত। দৃষ্টান্ত: **যমক**

> **এক** নামে **অনন্ত** নাম **অনন্ত এক** হএ।
> হেন যে অজপা নাম গুরুদেব কএ॥[৫১]

[জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ অর্থাৎ এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু পরম ব্রহ্ম থেকে সৃষ্ট এবং পরিশেষে তাঁরই মধ্যে বিলীন হয়। এক অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম থেকে অনন্তের সৃষ্টি এবং একেই অর্থাৎ পরম ব্রহ্মেই অনন্তের বিলীন। এখানে 'অনন্ত' সীমাহীন অর্থে এবং 'অনন্ত' পরমব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।]

শ্লেষ

> অগম সাগরের জলে করাইল স্নান
> অন্ধ ছিল রাজা **চক্ষু** পাইল দান॥ [৫২]

[গুপিচন্দ্র গুরু হাড়িপা কর্তৃক 'অগম' সাগরের জলে স্নাত হয়ে 'চক্ষু' দান পেলেন অর্থাৎ সাধারণ অর্থে অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পাওয়া কিন্তু অন্য অর্থে 'জ্ঞান' লাভ করা বা 'দিব্য দৃষ্টি' লাভ করা। কাজেই একটি শব্দ একবার ব্যবহার করে দ্ব্যর্থকতা প্রকাশ করায় শ্লেষ অলংকার হয়েছে।]

> **কর্ম** নাহি করে চিড়া খায় হাঁড়ি হাঁড়ি।
> তকারণে নফরের পাএ দিলাম বেড়ি॥[৫৩]

[সুলোচনী বারাঙ্গনা গুপিচন্দ্রকে শাস্তি স্বরূপ 'বসন্তের খরা'র সময়ে বুকের ওপর সাতমন পাথর বেঁধে রাখে। গুপিচন্দ্র গুরুকে স্মরণ করায় গুরু হাড়িপা এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। সুলোচনী তখন তাঁর দোষ স্খলনের জন্য হাড়িপাকে জানিয়ে দেয় সে গুপিচন্দ্রকে বৃথাই বান্ধা নিয়েছিল কারণ তিনি কোনো 'কাম' করেন নি এখানে 'কাম' অর্থে সাধারণভাবে কাজ বোঝানো হয়েছে,

অন্য অর্থে 'কাম' প্রেম বা কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কারণ সুলোচনী গুপিচন্দ্রকে যে উদ্দেশে বান্ধা নিয়েছিল তা পূরণ হয় নি।]

বক্রোক্তি

হাড়িফা বলেন বেশ্যা সব আমি জানি।
কর্ম নাহি করে নফর নিত্য উডাএ পানি॥[৫৪]

[গুপিচন্দ্র সম্পর্কে সুলোচনী বারাঙ্গনা যখন হাড়িপার কাছে অভিযোগ করেছে যে, বান্ধা নেওয়ার পরে গুপিচন্দ্র কোনো কাজ করে নি তখন হাড়িপা বাঁকা করে বলেছেন-গুপিচন্দ্র কাজ করে না কিন্তু সারা দিন পানি তোলে।]

রূপক

১. তুমি চন্দ্র তুমি ইন্দ্র [তুমি] **কল্পতরু**।[৫৫]
২. ঘট মধ্যে জানি মাতা **মনাই বড় চোর**। [৫৬]
৩. মনাকে বান্ধিনু মুই **প্রেমের দড়ি** দিয়া।[৫৭]
৪. **জ্ঞানফুল** হএ মাতা জগতের বাপা॥[৫৮]

উৎপ্রেক্ষা

১. স্বামী বিনে নারী লোকের নাহি কোন কুল।
পতি বিনে নারী যেন ধুতুরার ফুল॥[৫৯]
২. যখন মঞেনামতীর বালক জন্মিল।
আকাশের চন্দ্র যেন ভূমে প্রকাশিল॥[৬০]
৩. নিশির স্বপন যেন নারীর যৌবন।[৬১]
৪. নিহাল চন্দ্রের ঝি রূপেগুণে কব কি
যেন দেখি স্বর্গের বিদ্যাধরি॥ [৬২]

অতিশয়োক্তি

১. ক্ষেতু বলেন তোমরা খেলা করো দূর।
যুগী হয়া যাএ তোমার শিশের সিন্দুর॥[৬৩]
২. হাড়িফা মরিল অখন শব্দ গেল দূর।
রাজ্যেতে থাকিবে এখন শিশের সিন্দুর॥[৬৪]

সমাসোক্তি

মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম না জানি মধুর মর্ম
মধুলোভে হইল উপস্থিত॥[৬৫]

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে ঘাম অচেতন বস্তু কিন্তু মধু লোভে ফুলে আগমন চেতন পদার্থ অর্থাৎ ভ্রমরের বৈশিষ্ট্য। তাই দেখা যায় ঘামের ওপর ভ্রমরের বৈশিষ্ট্য আরোপ করায় সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে।

বিরোধাভাস

১. বলদ প্রসব হইল গাই হইল বাঞ্জা।
বাছুরেক দোহাএ তাহার দিন তিন সাঞ্জা॥[৬৬]

২. ছঞ্চার পানি ফুটি টুঞি করিয়া ধাএ।
শুয়া পক্ষি বসিয়া বিড়াল ধরিয়া খাএ॥[৬৭]
৩. শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে যুজে।
কুটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে॥[৬৮]
৪. ধ্যান করিলে জ্ঞানের পাএ সন্ধি।
মাকেড়ার সূতে আছে ঐরাবত বন্দী॥[৬৯]

বারমাসি বিহীন কাব্য মধ্যযুগে খুবই কম দেখা যায়। মনে করা হয় নিরক্ষর কৃষিজীবী সমাজে মুখে মুখে বারমাসির সৃষ্টি। তাই বারমাসির মূল উৎস প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজ। বারমাসির মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে নারী হৃদয়ের বিরহই প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণত পতিবিরহে নারী হৃদয়ের এক বছরের বেদনা-আর্তি এ অংশে ফুটে ওঠে। কবিরা তাঁদের কাব্যে নায়িকার অন্তরের বিরহ-বেদনার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এ অংশটিকে করে তুলেছেন আকর্ষণীয়। বলা চলে কাব্যের এ অংশটি করুণ সুরের আধার। প্রেমিক পুরুষের অবর্তমানে বিরহবিধুর প্রেমিকার হৃদয়ের আর্তিই বারমাসির মধ্যে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত:

> বারমাসি সঙ্গীত বিরহ সঙ্গীতেরই একটি বিশিষ্ট অংশ। পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপর বিরহিণী নারীর একটি সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কোন পল্লীকবি ইহার মনোবিশ্লেষণের উপর জোর দিয়া থাকেন, কেহ বা প্রকৃতি বর্ণনার উপরই জোর দেন উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া খুব কম কবিই ইহা রচনা করিতে পারিয়াছেন। কালক্রমে ইহা বিরহ সঙ্গীত রচনার একটি গতানুগতিক রীতিতে পর্যবসিত হইয়াছিল মাত্র।[৭০]

মধ্যযুগের অন্যান্য কবির মতো কবি শুকুর মাহ্মুদও তাঁর কাব্যে বারমাসির বর্ণনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। 'গোপীচন্দ্রের গানে বিরহিণীর বিলাপ এক করুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা করে। পাঠকমন সহজেই তাতে বিগলিত হয় ও বিরহিণীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে।'[৭১] গুপিচন্দ্র রাজ্যপাট ছেড়ে গুরু হাড়িপার অনুগত হয়ে সন্ন্যাসযাত্রা কালে রাজার চার রানি উত্তমরূপে সাজসজ্জা করে রাজাকে ভোলানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাজা তাঁদের দেখে মাথা হেট করে পালঙ্কে বসে থাকেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের রূপের জালে তিনি ধরা দেন নি। চার রানির মধ্যে অদুনা রাজাকে নানাভাবে বুঝাতে থাকেন। পতি বিনে অবলার কোন গতি নেই:

> অদুনা বলেন প্রভু শুন গুণমান।/ স্বামী বিনে নারী লোকের নিস্ফল জীবন॥
> নারী কুলে জন্ম যার নাহি প্রাণ পতি।/ চন্দ্রবিনে দেখি যেন অন্ধকার রাতি॥
> জল বিনে মৎস্যের জীবার নাহি আশ।/ স্বামী বিনে নারী লোকের সকলি বিনাশ॥[৭২]

এভাবে বৈবাহিক জীবনে সতীর কাছে পতির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কবি বারমাসির বর্ণনা করেছেন। স্বামী ছাড়া বারো মাসে স্ত্রীর জীবনে কেমন দুঃখ, দুর্দশা ও বিপর্যয় নেমে আসে তা করুণভাস্যে বারমাসির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। 'বারোমাস্যায় আদি ও মধ্যযুগে অঘ্রাণ মাসকে বছরের ১ম মাস হিসেবে ধরা হতো।'[৭৩] কিন্তু কবি শুকুর মাহ্মুদ বারমাসির বর্ণনা শুরু করেছেন বাংলা কার্তিক মাস দিয়ে এবং সমাপ্ত করেছেন আশ্বিন মাস দিয়ে। বাংলার

প্রকৃতিতে কার্তিক মাসে নির্মল রাত বিরাজ করে। মেঘমুক্ত আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো এবং শীতের আমেজ মানব মনে আনন্দের অপার বন্যা এনে দেয়। এমন সুন্দর মুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল মূর্তিই কাম্য। কিন্তু এ সময়ে স্বামী কাছে না থাকলে সবকিছুই বৃথা মনে হয়, মলিন হয় নারীর মুখ। দিন কিংবা রাত নারীর কাছে সমান মনে হয়:

কার্তিক মাসেতে স্বামী নিরমল রাতি।/ দিবস রজনী জ্ঞান যাহার ঘরে নাহি পতি॥
যৌবন কালেতে নারী ভাবে রাত্রি দিন।/ স্বামী বিনে রহে নারী সদাএ মলিন।[৭৪]

বারমাসির বর্ণনায় কবি যে ছবি অঙ্কন করেছেন তা গ্রাম-বাংলার চিরচেনা এক রূপের ছবি। বিরহিণীর দুঃখতাপিত হৃদয়ে স্বামী শূন্যতার যে করুণ রসের উদ্রেক করে তা বারমাসির প্রতিটি ছত্রে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন:

> গ্রামীণ সভ্যতার কবি শুকুর মাহ্‌মুদের সৃষ্ট বারমাসী গানে যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এক রূপসী পল্লী বালার। বর্ষার নদীর মত যৌবন তার আছড়ে পড়ছে সারা অঙ্গে। পরিধানে তার আট পৌড়ে সাড়ী, আভরণ তার বনফুল। তার চলার মধ্যে ছন্দ আছে, মাধুর্য আছে, রুচিরও অভাব নেই।[৭৫]

গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস কাব্যে কবি হেঁয়ালির ব্যবহার করেছেন। কবি সজ্ঞানে এ সমস্ত হেঁয়ালির ব্যবহার করেছেন বলেই মনে হয়। কাব্যটি মূলত তাত্ত্বিক কাব্য। তত্ত্বকথা বোঝাতে গিয়ে কবি হেঁয়ালির আশ্রয় নিয়েছেন। ময়নামতী ও গুপিচন্দ্রের কথোপকথনে এবং গুপিচন্দ্র ও হাড়িপার কথোপকথনে হেঁয়ালির ব্যবহার লক্ষণীয়। গুপিচন্দ্র প্রথমে রাজ্য ও স্ত্রীদের ছেড়ে সন্ন্যাসযাত্রা করতে রাজি হন নি। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর আয়ু মাত্র **১৮** বছর '**১৮** বছর প্রমাই **১৯**শে মরণ'[৭৬] কাজেই উপযুক্ত গুরু ধরে 'জ্ঞান' সাধনা না করলে মৃত্যু অনিবার্য। মায়ের এসব কথা শোনার পরেও গুপিচন্দ্র সন্ন্যাসযাত্রা করতে রাজি হন নি। অবশেষে ময়নামতী পুত্রকে গূঢ়তত্ত্বের কথা হেঁয়ালির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন:

সহস্র ফোঁটা রক্তে হএ রতি মহারস।/ সে ধন ফুরাইলে পুরুষ হএ নারীর বশ॥
সিংহের আকার নারী ব্যাঘ্রের মত চাএ।/ হাড় মাংস শরীরে থুইয়া মহারস টানি লএ॥
পুরুষের ধন লয়া নারী বেপার করে।/ লোভেতে থাকি পুরুষ সব বেগার খাটি মরে॥
আপনার হাল গরু বেগেনার জমি চাষ।/ আব্বলের ক্ষয় আর বিছনের বিনাশ॥
লোহা দিয়া বান্ধে লাঙ্গল মাটিতে জাএ ক্ষএ।/ থোড় কলা বাঁদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ॥
কাঁচা বাঁশে ঘুণ লাগিলে কতই ভর সএ।/ মূল থুনিতে ঘুণ লাগিলে ঘর পড়িবার চাএ॥
বন্ধন ছুটিলে ঘরের নাহিক উপাএ।/ ছুটিলে কতক ধ্বজা ঘর পড়ে যাএ॥
আউট [হাত] বৃক্ষের বাছা জোড়া দুইটি ফল।/ নযরে পাপের কারণ সংসার বিকল॥
পুরুষের ভক্ষণ নহে খাইতে না যুয়াএ।/ এহি সব কথা মঞেনামতী কএ॥
সে সুখ ভুঞ্জিলে পুরুষ যম ঘরে জাএ।/ শৃঙ্গার ভুঞ্জিলে বাছা ভাণ্ড হবে খালি।
দিনে দিনে রসাতল পুরুষের গাভুরালি॥[৭৭]

প্রবাদ সাধারণত সরলতা, সংক্ষিপ্ততা, বাস্তবতা, রসিকতা, ব্যঞ্জনাময়তা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে। 'বিভিন্নমুখী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহু পরীক্ষিত উপদেশ ও নীতি প্রচার করাই ইহার লক্ষ্য-রূপক ও বক্রোক্তি প্রধানতঃ ইহার অবলম্বন।'[৭৮] বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন *চর্যাপদ* থেকে শুরু করে মধ্যযুগে রচিত বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে, কাশীরাম দাসের *মহাভারত*-এ এবং মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের

অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার লক্ষণীয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্তরের তীব্র অনুভূতির কাব্যিক প্রকাশই প্রবাদের জন্মভূমি। প্রবাদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্যে অনেক প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এগুলো তৎকালীন বাস্তব সমাজ থেকে সৃষ্ট। কাব্যে উল্লিখিত কিছু প্রবাদের দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করছি:

১. গত কার্য বিস্মরিলে নাহি কিছু গুণ।/ আটখুরা করিবে বাছা যম নিদারুন॥[৭৯]
২. গুরুর চরণে যেহি নাহি বান্ধে মন।/ নিশ্চএ জানিও তাহার বিধি বিড়ম্বন॥[৮০]
৩. বিধাতার নিরবন্ধ যত না যাএ খণ্ডন।/ হাড়িফার তরে সবে করিল বন্ধন॥[৮১]
৪. সে বড় মহন্ত হএ ক্ষেমে অপরাধ।/ হতো জ্ঞানী হএ যে জন করে বিসমবাদ॥[৮২]
৫. সর্বদোষ স্ত্রীর বাছা এক খানি গুণ।/ স্ত্রীর পেটেতে যদি জন্মে মহাজন॥[৮৩]
৬. লোহা দিয়া বান্ধে লাঙ্গল মাটিতে জাএ ক্ষএ।/ থোড় কলা বাঁদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ॥[৮৪]
৭. মচ্ছ চিনে গহীন গম্ভীর পঙ্খী চিনে ডাল।/ মাএ জানে পুত্রের দশা প্রাণ পোড়ে যার॥[৮৫]
৮. জন্মিলে মরণ আছে সর্ব্ব শাস্ত্রে কএ।/ আমি হইব স্ত্রীর সেবক মরণের ভএ॥[৮৬]

সাহিত্য

নাথ সাহিত্যধারার উল্লেখযোগ্য কবি শুকুর মাহ্মুদ। নানা প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করেও কবি শুকুর মাহ্মুদ যে কাব্যচর্চা করেছেন তা অবিস্মরণীয়। মধ্যযুগের অনেক কবিদের প্রতিভার সঙ্গে শুকুর মাহ্মুদের কবি প্রতিভার তুলনা করা যেতে পারে। সমাজের ছবি অঙ্কন, চরিত্রচিত্রণ, শব্দপ্রয়োগ, ছন্দের ব্যবহার, অলংকার প্রয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কবি শুকুর মাহ্মুদ সফলতার দাবিদার। নাথধর্মের গূঢ়তত্ত্ব উন্মোচনের ক্ষেত্রেও কাব্যটির ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সময়েও কোনো কোনো এলাকায় যোগীর গান গীত হয়ে থাকে। মধ্যযুগে রচিত হলেও *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্যটি তাই কালের সীমা অতিক্রম করে বর্তমান সময়েও তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে পেরেছে। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা কাব্যটি নাথধর্মের তত্ত্ব-উন্মোচন করেও কাব্যপিপাসুগণের মনের খোরাক জোগাতে সহায়ক হয়েছে। সবদিক বিচার-বিশ্লেষণ করে তাই শুকুর মাহ্মুদের *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* কাব্যটিকে একটি অসাধারণ কাব্য বলা যেতে পারে।

তথ্যসূচি:

---

১ সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: মধ্যযুগ*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৭৯
২ কল্যাণী মল্লিক, *নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০, পৃ. ১
৩ আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *গোপীচন্দ্রের গান*, পু. মু., কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়, কলিকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৯
৪ তদেব, পৃ. ৪৬০-৪৬১

৫ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড*, পু. মু., নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৫৬
৬ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২১৫
৭ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৩৫২
৮ বদিউজ্জামান (সম্পাদিত), *রংপুর গীতিকা, প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. (প্রসঙ্গ কথা)
৯ তদেব, পৃ. (প্রসঙ্গ কথা)।
১০ আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *গোপীচন্দ্রের গান*, পৃ. সাঁইত্রিশ
১১ শুকুর মাহ্মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পাদিত), বাঙলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১২*৮*
১২ মুহম্মদ আবূ তালিব, *উত্তর বঙ্গে সাহিত্যসাধনা (৬৫০-১৮০০ খ্রীঃ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৭৫, পৃ. ২৯২
১৩ সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: মধ্যযুগ*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৯৬
১৪ শুকুর মাহ্মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. আট
১৫ মুহম্মদ আবূ তালিব, *উত্তর বঙ্গে সাহিত্যসাধনা*, পৃ. ২৮৫
১৬ শুকুর মাহ্মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ১৮৩
১৭ তদেব, পৃ. ৪
১৮ তদেব, পৃ. ১৪৮
১৯ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ২য় সং., ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ২৮২
২০ আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *গোপীচন্দ্রের গান*, পৃ. ৪৩৭
২১ শুকুর মাহ্মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ৭১-৭২
২২ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, *ভারত কোষ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩
২৩ শুকুর মাহ্মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, *পৃ. ২০*
২৪ তদেব, পৃ. ১৫
২৫ আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সামাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৩২
২৬ শুকুর মাহ্মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ৬৪
২৭ তদেব, পৃ. ৫৪
২৮ তদেব, পৃ. ৬১
২৯ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, ষষ্ঠ সং., ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪১৪, পৃ. ১৪২
৩০ শুকুর মাহ্মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ১৮০
৩১ তদেব, পৃ. ৬১-৬২
৩২ তদেব, পৃ. ৮০
৩৩ মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, ৪র্থ মুদ্রণ, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৬২
৩৪ শুকুর মাহ্মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ৮১
৩৫ তদেব, পৃ. ৮১-৮২
৩৬ তদেব, পৃ. ১৬
৩৭ তদেব, পৃ.১৭৪
৩৮ তদেব, পৃ. ১৭২
৩৯ তদেব, পৃ.১৭৮
৪০ তদেব, পৃ. ১৭৯
৪১ তদেব, পৃ. ৫৬
৪২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, পৃ.৬৫
৪৩ শুকুর মাহ্মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ১৮১
৪৪ তদেব, পৃ. ৮০

৪৫ তদেব, পৃ. ২৯-৩০
৪৬ শ্যামদাস সেন, *মীন-চেতন*, নলিনীকান্ত ভট্টশালী (সম্পাদিত), ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ, ১৩২২, পৃ. (ভূমিকাংশ)
৪৭ আবদুল লতিফ, *ছন্দ-পরিচিতি*, ৫ম সং., ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ৩২
৪৮ মাসুমা খানম, *বাংলা লোকগীতিকার শিল্পরূপ*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৪৮
৪৯ শুকুর মাহ্‌মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ১৩৭
৫০ সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: মধ্যযুগ*, পৃ. ৪০৭
৫১ শুকুর মাহ্‌মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ১৪৯
৫২ তদেব, পৃ. ১৪৮
৫৩ তদেব, পৃ. ১৪৬
৫৪ তদেব, পৃ. ১৪৭
৫৫ তদেব, পৃ. ১৮২
৫৬ তদেব, পৃ. ১৬৫
৫৭ তদেব, পৃ. ১৬৫
৫৮ তদেব, পৃ. ১৬৮
৫৯ তদেব, পৃ. ৯৩
৬০ তদেব, পৃ. ৩
৬১ তদেব, পৃ. ৯৪
৬২ তদেব, পৃ. ৫৮
৬৩ তদেব, পৃ. ৮৩
৬৪ তদেব, পৃ. ১১২
৬৫ তদেব, পৃ. ১২৪
৬৬ তদেব, পৃ. ১৮০
৬৭ তদেব, পৃ. ১৮০
৬৮ তদেব, পৃ. ১৮১
৬৯ তদেব, পৃ. ১৭৬
৭০ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, পৃ. ২৬৭
৭১ কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২৫৩
৭২ শুকুর মাহ্‌মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ৯০
৭৩ অনীক মাহমুদ, অনীক মাহমুদ-*প্রবন্ধ সংগ্রহ ৪*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪২২
৭৪ শুকুর মাহ্‌মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ৯১
৭৫ তদেব, পৃ. ১৫২
৭৬ তদেব, পৃ. ২৩
৭৭ তদেব, পৃ. ৬১-৬২
৭৮ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, পৃ. ৪৯৭
৭৯ শুকুর মাহ্‌মুদ, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পৃ. ১৬
৮০ তদেব, পৃ. ২২
৮১ তদেব, পৃ. ৩০
৮২ তদেব, পৃ. ৩০
৮৩ তদেব, পৃ. ৬০
৮৪ তদেব, পৃ. ৬১
৮৫ তদেব, পৃ. ৬২
৮৬ তদেব, পৃ. ৭৯